ঠাকুরবাড়ির বিধবাবিবাহ ও অন্যান্য

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

পুনশ্চ

ভূমিকা

বছর কয়েক আগে আমার ঠাকুরবাড়িকেন্দ্রিক একটি প্রবন্ধের সংকলন এই 'পুনশ্চ' থেকেই বেরিয়েছিল। 'ঠাকুরবাড়ি সংক্রান্ত' নামের সেই বইতে আঠারোটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। এই ক'বছরে আরও অনেক প্রবন্ধ জমে গেছে। ঠাকুরবাড়ি বিষয়ক চব্বিশটি প্রবন্ধ নিয়ে এই নতুন সংকলনটি বেরল। শিশুসাহিত্য নিয়েই আমার যত আগ্রহ, ছোটোদের জন্য লেখা, শিশুসাহিত্য নিয়ে গবেষণা ও হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধার—এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকি। এরই মাঝে কখনো পুরোনো সাময়িকপত্রের পাতা ওল্টাই, হারাতে বসা মণিমাণিক্য উদ্ধার করে ফেলি, কোনো কোনো সাময়িকপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও লেখা হয়ে যায়। আমার এই ভালো লাগায়, চর্চায়, শিশুসাহিত্য ও সাময়িকপত্রের পাশাপাশি ঠাকুরবাড়িও আছে। বিস্ময়-জাগানিয়া পরিবারটিকে ঘিরে শুধু আমার নয়, আমাদের আগ্রহ-কৌতূহলের শেষ নেই। এই আগ্রহ-কৌতূহলের টানেই আমার কিছু লেখা তৈরি হয়েছে। নজরে এসেছে আড়ালে থাকা নানা রত্নসামগ্রী। ঠাকুরবাড়ির 'পার্বণী', অবনীন্দ্রনাথের 'স্বপ্নের মোড়ক' বা জ্ঞানদানন্দিনীর রচনাসমগ্র আমার খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায় এত বছর ধুলো মেখে পড়েছিল, ভাবতেও কেমন অবাক লাগে! ঠাকুরবাড়ি জুড়ে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান, রবীন্দ্রনাথের বাইরেও এমন কেউ কেউ আছেন, এমন কত কিছু আছে, যা নতুন করে আলোচনার দাবি রাখে, আলোকিত করা জরুরি—সেসব এসেছে এ বইতে। আছেন রবীন্দ্রনাথও। তাঁকে বাদ দিয়ে ঠাকুরবাড়ি কেন, কিছুই হয় না। বিস্ময়কর এই মানুষটি! যতদিন যাচ্ছে, ততই তাঁর ঔজ্জ্বল্য বাড়ছে, আমরা অভিভূত হচ্ছি।

এ বইয়ের শেষ প্রবন্ধটি সে-অর্থে ঠাকুরবাড়িকেন্দ্রিক নয়। জগদানন্দ রায় রবীন্দ্রপরিমণ্ডলের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। শান্তিনিকেতন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে স্বপ্ন, তা সফল করার ক্ষেত্রে জগদানন্দের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। হোক না ঠাকুরবাড়ি বহির্ভূত ব্যক্তিত্ব, তাঁকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধটিও এ বইতে রাখা হল। রবীন্দ্র-বান্ধব হরিশ্চন্দ্র হালদারকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধটির অন্তর্ভুক্তি ঘিরেও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে ঠাকুরবাড়িকেন্দ্রিক বলেই আমাদের মনে হয়েছে।

পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে থাকা আমার এইসব লেখা গ্রন্থিত হল 'পুনশ্চ'-র প্রাণপুরুষ সন্দীপ নায়কের সৌজন্যে, ব্যবস্থাপনায়। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। প্রাসঙ্গিকভাবে একই কথা গ্রন্থিত একাধিক প্রবন্ধে হয়তো বা এসেছে। নানা বিষয়ের ছোটো ছোটো প্রবন্ধ একত্রিত করলে এমন সমস্যা প্রায়শই হয়। সহৃদয় পাঠকের কাছে আগাম মার্জনা প্রার্থনা করি।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচি

ঠাকুরবাড়ির বিধবাবিবাহ : রবীন্দ্র ভাবনার বৈপরীত্য	১১
ঠাকুরবাড়ির বধূ ও জামাতা : ভিন্‌দেশি ভিনভাষী	২৩
ঠাকুরবাড়ির দুর্গোৎসব	২৯
ঠাকুরবাড়ির দোল	৩৪
রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	৩৮
খামখেয়ালির ঠাকুরবাড়ি	৪৪
ঠাকুরবাড়ির বিয়েশাদি	৪৯
তেনারা যখন ঠাকুরবাড়িতে	৫৪
কবির প্রতিমা	৬২
হরিশ্চন্দ্র : কবির সহপাঠী বন্ধু	৭১
রবীন্দ্র-অগ্রজ বিস্মৃত হেমেন্দ্রনাথ	৭৭
বাইশে শ্রাবণ	৮৯
সেদিনও ছিল বাইশে শ্রাবণ	৯৮
৬ নম্বর জোড়াসাঁকো	১০৪
গুপ্তনিবাস	১১৩
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর একটি অগ্রন্থিত কবিতা	১২২
রবীন্দ্র-উপন্যাস : নতুন পথের দিশারী	১৩২
সহজপাঠ : গ্রামজীবনের আলেখ্য	১৪৪
ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সাহিত্যচর্চা	১৫৩
রথীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথে নিবেদিত একটি জীবন	১৬১
মাধুরীর গল্প : গল্পের মাধুরী	১৭২
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যের এক বিস্মৃত অধ্যায়	১৮৩
হেমলতা দেবীর গল্প : 'অভিজ্ঞতার চিত্রপ্রদর্শনী'	১৯৭
জগদানন্দ রায় ও তাঁর আশ্চর্য জগৎ	২০৭

ঠাকুরবাড়ির বিধবাবিবাহ : রবীন্দ্র-ভাবনার বৈপরীত্য

মেয়ে-মনের যন্ত্রণা কতখানি তীব্র ছিল উনিশশতকে, তার পুরো না হলেও ছেঁড়া-ছেঁড়া কিছু ছবি ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্তত সাহিত্যে। মেয়ে-জীবন হয়ে উঠেছিল অসহ্য, দুর্বিষহ। সহমরণ প্রথা আইন করে বন্ধ করার পর বিষময় জীবনে যবনিকা নেমে আসেনি, শুরু হয় নতুনতর যন্ত্রণা। বৈধব্যের যন্ত্রণায়, সামাজিক অনুশাসনে জীবন জেরবার হয়েছে। বিপন্নতা কমেনি, বরং বেড়েছে। সেই অদ্ভুত আঁধারে আলোকবর্তিকা জ্বালাতে বিদ্যাসাগরের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। বৈধব্যের সীমাহীন যন্ত্রণা হৃদয় দিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন। সুদৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, 'বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই।'

এ কাজ করতে গিয়ে চরম হেনস্থা হতে হয়েছিল। প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়তে হয় বিদ্যাসাগরকে। আধুনিকতার অগ্রপথিক তিনি। কথায় ও কাজে এক, তৈরি করেছিলেন মহতী দৃষ্টান্ত। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন বিধবা ভবসুন্দরীর। ভবসুন্দরীর বয়স তখন চোদ্দো, নারায়ণচন্দ্রের বাইশ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজজীবনে বিদ্যাসাগর যে আলোকবর্তিকা জ্বালালেন, তা ছড়িয়ে পড়েছে সমকাল ছাড়িয়ে পরের কালে। বোধোদয় হয়েছে বৃহত্তর মানুষের।

ঠাকুরবাড়ি নিয়ে আমাদের বিস্ময়ের শেষ নেই। চিন্তায় চেতনায় আধুনিকতার মূর্ত প্রতীক। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শুধু নয়, বলা যায়, জীবনের সর্বস্তরে ওই পরিবারে এক সামগ্রিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। সেই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে সমাজজীবনেও। বিদ্যাসাগর হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও যে বিধবাবিবাহ প্রচলন করেছিলেন, তা উদার স্বীকৃতি পেয়েছিল ঠাকুরবাড়িতে, রবীন্দ্রনাথের কাছে। আপাতভাবে হয়তো এমন মনে হয়। বাস্তবে কি সত্যিই তাই? বিধবা বিবাহের একদা তো প্রবল বিরোধিতাও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কন্যা রেণুকা মারা গিয়েছিলেন বড়ো অকালে, তখন তাঁর বয়েস বারো বছর আট মাস। জামাতা সত্যেন্দ্রনাথকে কবি বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় বিলেতে গিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, হোমিওপ্যাথিতে উচ্চশিক্ষা লাভের

উদ্দেশে। ওদেশে যাওয়ার খরচ জোগানোর শর্তেই কবিকন্যাকে বিবাহ করতে রাজি হয়েছিলেন জামাতা বাবাজীবন। রবীন্দ্রনাথ সে-শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। শ্বশুরমশায়ের পয়সায় বিলেতে গিয়ে ডাক্তারি পড়া অসমাপ্ত রেখে ফিরে এসেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। 'অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রির উপর হোমিওপ্যাথিক চূড়া' চড়ানোর ইচ্ছাতেই আমেরিকায় গিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে একথা লিখেছিলেন জগদীশচন্দ্রকে। দেশে ফেরার পর ডিসপেনসারি সাজিয়ে দেওয়ারও খরচ জুগিয়েছিলেন কবি। না, মন দিয়ে ডাক্তারি করেননি, পসার জমেনি সত্যেন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ শেষে শান্তিনিকেতনের কাজে সসম্মানে নিয়োগ করেছেন তাঁকে। সে-কাজও মন দিয়ে করেন নি। অস্থিরতা বুঝি তাঁকে ধাওয়া করে বেড়াত। কোনো কাজেই সেভাবে মনোযোগী হতে পারতেন না। এক সময় কবির শান্তিনিকেতনের দায়দায়িত্ব থেকে অব্যহতিও নিয়েছিলেন। আবার রেণুকার অকালপ্রয়াণের সাত মাস পর শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। রেণুকা যখন চরম সংকটে, তখনও তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি সামান্য সহমর্মিতা। রোগক্লিষ্ট স্ত্রীর পাশে না থেকে গিয়েছিলেন পঞ্জাব-ভ্রমণে।

রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ রেণুকাকে নিয়ে আলমোড়ায় গিয়েছিলেন। পাহাড়ি পরিবেশে, অনুকূল জল-হাওয়াতেও সুস্থ হয়ে ওঠেননি, বরং অবস্থার অবনতি হয়েছে। নিরুপায় রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছেন জোড়াসাঁকোয়। কন্যা-প্রয়াণের মাস সাতেক পর সত্যেন্দ্রনাথের একটি পত্র আসে রবীন্দ্রনাথের হাতে। শান্তিনিকেতনে তিনি পুনরায় যোগ দিতে চান। করতে চান শিক্ষকতা।

রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষাই করতে পারতেন। তা তিনি করেননি। রেণুকার প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন না, ছিলেন না সামান্যও দায়িত্ব-পরায়ণ। সেসব কবি মনে রাখেননি। শান্তিনিকেতনে ডেকে নিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথকে। কবির মনের কোণে তাঁর জন্যও সঞ্চিত ছিল স্নেহ। কবি উদ্যোগী হয়ে বিবাহ-ব্যবস্থাও করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করে সকলের যথেচ্ছ সমর্থন পেয়েছিলেন, তা তো নয়! মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন! দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আদি ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমেই পরিবর্তিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় বিধবা বিবাহের বিবরণ সযত্নে ছাপা হয়েছে। বোঝা যায় বিরোধিতার জায়গা থেকে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন সরে যাচ্ছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের গোপন ইচ্ছা চরিতার্থ করতে সহায়তা করেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না!

বিপত্নীক সত্যেন্দ্রনাথ পুনর্বিবাহ করুক, সংসারজীবনে ফিরে আসুক—অন্তর থেকে চেয়েছিলেন কবি। মনে মনে শুধু চাননি, সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আশুতোষ

মুখোপাধ্যায় যাবতীয় সামাজিক বাধা অতিক্রম করে পুনর্বিবাহ দিয়েছিলেন তাঁর বিধবা-কন্যার। এই ঘটনাটি কবিকে এতই প্রাণিত করেছিল যে, এক বিধবা কন্যার সঙ্গে তিনিও জামাতার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির সতীন্দ্রমোহন-কন্যা ছায়ার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮ জুন ১৯০৮। রেণুকা মারা যাওয়ার বছর পাঁচেক পর অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই বিয়ে। ঠাকুরবাড়ির এটিই প্রথম বিধবা-বিবাহ। এ বিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ ও তৎপরতা ছাড়া কখনও সম্ভব হত না। প্রশান্তকুমার পাল 'রবিজীবনী'-র ষষ্ঠ খণ্ডে 'ক্যাশ বহি' থেকে দু একটি উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন, এই বিয়েকে ঘিরে কতখানি সক্রিয় হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিবাহ-অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। আলাপ-আলোচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ পাথুরিয়াঘাটাতেও গিয়েছিলেন। বিয়ের দিন তিনেক পর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কবি লিখেছেন, 'এ সপ্তাহও বিয়ের হাঙ্গামে কলকাতায় আবদ্ধ হয়ে আছি। গতকাল ফুলশয্যা হয়ে বিবাহের অনুষ্ঠান চুকে গেছে। আজ সত্য তার নববধূকে সঙ্গে করে আমাদের এখানে এসেছে। ...সত্য বিবাহ করে চিকাগোতে গিয়ে ডাক্তার হবে কথা ছিল কিন্তু শ্বশুরের কাছ থেকে কেবলমাত্র তিন হাজার টাকা পাবার আশা আছে। সেই জন্যে এই অল্প সম্বলে আমেরিকায় যাওয়া দুঃসাধ্য, সে সংকল্প সে পরিত্যাগ করেছে। এখন কথা হচ্ছে কাশীতে গিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হবে।'

কবি জোড়াসাঁকোয় সত্যেন্দ্র-ছায়াকে আতিথ্য দিয়েছিলেন। এমনকি মৃতা কন্যার গয়নাও ছায়ার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ছায়ার আঁধার জীবনে আলো জ্বলে উঠেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ভেতরে ভেতরে ছিলেন অসুখী মানুষ। স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। ডাক্তারি না করে শান্তিনিকেতনে মাস্টারি করেছেন। মুখে কখনও কিছু না বললেও মনের কোণে নিশ্চিতভাবে জমাট বেঁধেছিল আশা-স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। সেই বেদনা মুছে দিতে চেয়েছিলেন কবি। কবির সেই আন্তরিক ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সত্যেন্দ্রনাথ পূজাবকাশের অব্যবহিত পূর্বে শারদোৎসব নাটক অভিনয়ের সময় আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তারপর পূজার ছুটির সময় তিনি ও দিনেন্দ্রনাথ পশ্চিম ভারত ভ্রমণে বাহির হন; লাহোর পৌঁছিলে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও তিনচারিদিনের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে।'

এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন কবি। সেই শোকজর্জর পরিস্থিতিতে কবির হৃদয় প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছিল। সে সময় কবির মনে বোধহয় খানিক অপরাধবোধও জেগেছিল। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, 'বিধবা ছায়ার কথা তাঁহার মনে হইতেছে, কারণ তিনিই উদ্যোগ করিয়া বিবাহ দেন।...কবির মনে বিধবাদের ভবিষ্যৎ

সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠে। একদিন মেয়েদের সঙ্গে এইসব কথার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠেন, আমি রথীর বিবাহ হয় অসবর্ণে দিব, নয় বিধবার সহিত দিব।'

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু, ছায়ার পুনরায় বিধবা হওয়া রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে ভাবিয়েছিল। বিয়ের চার মাস পরই ছায়াকে আবার বিধবা হতে হয়। ছায়াকে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে 'অনাথা', তার জন্য কাতর হয়েছেন কবি। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, 'সত্যেন্দ্র তিন চারদিন জ্বরে ভুগিয়া নববধূকে অনাথা করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিদায় লইয়াছে। মৃত্যুর লীলা অনেক দেখিলাম।'

পরের বছর শোক-বিধ্বস্ত ছায়াকে স্বাভাবিকজীবনে আনার তাগিদে অভিভাবকরা আবার তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঢাকার সুপরিচিত ব্রাহ্ম নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র নলিনীকান্তের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ছায়ার। নবকান্তের মেয়ে চারুবালার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল। ছায়ার সঙ্গে নলিনীকান্তের বিয়েতে হয়তো রবীন্দ্রনাথও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও এমন অনুমান করার সংগত কারণ রয়েছে।

বিদ্যাসাগর পেরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের দেখানো পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ অগ্রবর্তী হয়েছিলেন। পরিচয় দিয়েছিলেন মহানুভবতার। বিধবা কন্যাকে পুত্রবধূ করে ঘরে এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছায়ার বিয়ে হওয়ার বছর খানেক পর পুনরায় বিয়ে হয়েছিল প্রতিমার। বিয়ে হয়েছিল কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের সক্রিয়তা ও সদিচ্ছাতেই এই বিয়ে সম্ভব হয়েছিল। প্রতিমা ঠাকুরবাড়িরই একজন। পাঁচ নম্বর বাড়িতে থাকতেন। ওই বাড়িতেই বেড়ে ওঠা, কেটেছে ছেলেবেলা। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, গুণেন্দ্রনাথের কন্যা, অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের বোন বিনয়নী দেবী ছিলেন প্রতিমার মা, পিতা শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র তিনি। শেষেন্দ্রভূষণ-বিনয়িনীর দ্বিতীয় সন্তান প্রতিমা। প্রথা মেনে অনেক জামাইয়ের মতো শেষেন্দ্রভূষণও 'ঘরজামাই' ছিলেন । ফলে ওই ঐতিহ্যবহ বাড়িতে, গুণিজনের উজ্জ্বল সমাবেশে প্রতিমা বেড়ে উঠেছিলেন। বিবাহসূত্রে একসময় ও বাড়ি ছাড়তে হলেও শেষে আবার ফিরে এসেছিলেন।

প্রতিমা দেবীর 'স্মৃতিচিত্র' বইতে রয়েছে তাঁর শৈশবস্মৃতির আশ্চর্য বর্ণনা। চোখের সামনে যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাঁচ নম্বর বাড়ির ছবি, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের চিত্রমালা। প্রতিমা দেবী লিখেছেন, 'সকাল থেকে একটা কর্মের স্রোত বইত সেখানে। আসছে মেছুনী, নাপিত, সরকার, আসছে তরকারি বাজার, আমলার হিসেব, দাসদাসীর অনুযোগ-অভিযোগের বিচার, বোষ্টমীর কীর্তন, ভিখারির 'জয় রাধে, শ্রীকৃষ্ণ'—জীবনের

কত বিচিত্র ধারা চলত সকাল থেকে। সে যেন বৃহৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত রূপ, একটা একান্নবর্তী পরিবার ঘিরে তার নিত্য ব্যবস্থা।'

প্রতিমা দেবীর বিয়ে হয় নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নীলানাথের সঙ্গে, ১৯০৩-এর মার্চে। এই মুখোপাধ্যায়-পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের ছিল আত্মীয়তার বন্ধন। নীলানাথের পিতা নীরদনাথ ছিলেন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়। গিরীন্দ্রনাথ-কন্যা কুমুদিনীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের। কুমুদিনী-নীলকমলের একমাত্র পুত্র নীরদনাথ। নীরদনাথ ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী। নীরদনাথের দুই পুত্র ও চার কন্যা, তাঁদের একজন নীলানাথ। নীলানাথের যেভাবে মৃত্যু হয়েছিল, তা বড়োই বেদনার, খুবই মর্মস্পর্শী।

নীলানাথের সঙ্গে বিবাহকালে প্রতিমা ছিলেন দশ বছরের কিশোরী। বিয়ের মাস দুয়েকের মধ্যে ঘটে ভয়ংকর সেই দুর্ঘটনা। জলে ডুবে মারা যান নীলানাথ। সেই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং প্রতিমা দেবী। স্বচক্ষে দেখেছিলেন নিদারুণ সেই দৃশ্য। 'ঠাকুরবাড়ির গগনঠাকুর' বইতে গগনেন্দ্র-কন্যা পূর্ণিমা দেবী লিখেছেন, 'বৈশাখ মাসে গরমের সময় ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে সকলে গঙ্গার ধারে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাগানবাড়ি সুরধুনী কাননে বেড়াতে যান। ...তখন বেলা দুটো কি তিনটে হবে। বাবা (গগনেন্দ্রনাথ) এসে দিদিমাকে বললেন, 'নীলানাথ গঙ্গায় চান করতে নেমেছিল। আর পাওয়া যাচ্ছে না। কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আমরা তিনজনে যাচ্ছি, দেখে আসি কী হল।' ফিরে এসে বললেন 'একটা ছোঁড়া চাকরকে সঙ্গে নিয়ে নদীতে সাঁতার শিখতে গিয়েছিল। সকলে বারণ করে, কিন্তু কারও কথা শোনেনি। নদীতে বান আসার কথা জানত না। হঠাৎ বান আসতে ডুবে যায়...।'

ডুবুরি আসে। খুঁজে পেতে দেহও উদ্ধার করে আনে। না, দেহে আর তখন প্রাণ নেই। পূর্ণিমার লেখায় আছে, প্রতিমা দেবী তখন ছাদে, এই ঘটনার তিনি সাক্ষী। পূর্ণিমা দেবী লিখেছেন, 'প্রতিমাদিদির কাছে শুনেছিলুম ও আর নীলানাথের ভাই নরনাথের মেয়ে তনুজা ছাদ থেকে দেখছিল।'

সদ্য বিবাহিত কিশোরী কন্যাকে এমন মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে হয়েছিল, ভাবতেও খারাপ লাগে। এই ভয়ংকর বিপর্যয়ের পর শোক-বিধ্বস্ত প্রতিমা দেবী শ্বশুরালয়ে সহমর্মী ব্যবহার পান- নি। পেয়েছেন তিরস্কার। যে সময়ে এ ঘটনা ঘটে, সে সময় সমাজ-জীবনে, পরিবারে নারীর অবস্থান সুখকর ছিল না। সমাজে নারীর সম্ভ্রমের আসন ছিল না। গগনেন্দ্র-কন্যার বই থেকে জানা যায়, প্রতিমাকে 'অপয়া' অপবাদে ভূষিত হয়ে ফিরে যেতে হয় পিত্রালয়ে।

মৃণালিনী দেবীর বড়ো পছন্দ ছিল প্রতিমাকে। ছোট্ট প্রতিমার বয়স তখন তিন-চারের